সপ্তপর্ণী

৭টি ছোট গল্পের সংকলন

দেবযানী দত্ত

সপ্তপর্ণী

দেবযানী দত্ত

উৎসর্গ

জয় মা তারা

আমি আমার প্রথম বই
'সপ্তপর্ণী' আমার বাবা, স্বর্গীয় দেবেশ
চন্দ্র দত্ত ও শ্বশুরমশাই স্বর্গীয় জগজ্জ্যোতি
দত্ত, এনাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

দেবযানী দত্ত

লেখিকার পরিচয়

লেখিকা দেবযানী দত্ত বেশ ছোট থেকেই লেখালিখি শুরু করেন। পড়ার বইয়ের ফাঁকেই থাকত গল্পের বই, ডায়েরি এবং কলম। নানান ধরনের বই পড়ার পাশাপাশি চলে লেখার কাজ। কবিতা, গল্প সবই চলে তার মধ্যে। সদ্য কলেজে ঢুকে যুক্ত হয়ে পড়েন, বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিনে। এর পাশাপাশি শ্রুতি নাটক এবং নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখাও চলে। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে যুক্ত থাকাকালীন বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছেন। প্রথিতযশা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছে ছড়া লিখেও সমাদৃত হয়েছেন। প্রত্যেক বছর বিভিন্ন পত্রিকার পুজো এবং বইমেলা সংখ্যায় ওনার গল্প কবিতা ছাপা হয়েছে। মাঝে কয়েক বছর সাহিত্যসভা ইত্যাদি থেকে সরে আসলেও লেখালেখি চলত খাতার পাতায়। তার মায়ের এবং পরবর্তীতে স্বামীর অনুপ্রেরণায় তা থামেনি।

বর্তমানে ফেসবুকে অণুগল্প এবং ছোটগল্প লিখে পাঠক পাঠিকার কাছে সমাদর পাচ্ছেন। নতুন ভাবে যুক্ত হয়েছেন সম্পাদনার কাজেও।

সূচিপত্র

সাধের লাউ

দেবযানী দত্ত

সকাল থেকে সব কাজ উলটো পালটা হয়ে যাচ্ছে বন্যার। মেয়ের স্কুলের টিফিন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেল।

"মা গো" বলে চেয়ারে বসল। নখের কোন দিয়ে রক্ত। ওর শাশুড়ি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বরফ এনে দিলেন। দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল চোখ দিয়ে বন্যার।

"আহা! দেখে কাজ করবে তো। শীতের দিনে পরে ব্যাথা বাড়বে।"

উফ! কি আনন্দ। এই চোখের জলটার খুব দরকার ছিল বন্যার। সকাল থেকে গুমরে মরছিল বুকটা।

"বৌমা, খুব লেগেছে না।তুমি বোস। আমি মিনিকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে আসছি।"

"না মা, একটু লেগেছে। তেমন কিছু না।"

"তেমন কিছু না বললে হবে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে।"

"ও কিছু না, হঠাৎ লেগেছে তো তাই।"

বন্যা আবার রোজকার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই দিনটা সে নিজের মত করে মনে রাখে। আজ ওর বাবার মৃত্যুদিন। যখন স্কুলের শেষের দিক তখন ওর বাবার মৃত্যু হয়। গান অন্ত প্রাণ ছিল মানুষটা। নিজের গানের স্কুল ছিল। অনেক ছাত্র- ছাত্রী। তবু নিজের সবটুকু বন্যার মধ্যে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, বিধাতা বিমুখ। পুরোটা দিয়ে যেতে পারেননি। অকালে চলে যাওয়ায় বন্যা আর ওর মা অকূলপাথারে পরলেও আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।আর গানটা কোনও ভাবে ছাড়েনি বন্যা।

কিন্তু বিয়ের পর কিভাবে যেন সবকিছু দূরে চলে গেল। তবে একমাত্র মেয়ে মিনি একটু বড় হতে শ্বশুরমশাই নিজের উদ্যোগে আবার ওকে গানের জগতে ফেরাতে ব্যস্ত হয়েছেন। বাথরুমে, মেয়েকে ঘুম পাড়াতে বা ঘরের আসবাব মোছার

সময় ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে গান। কেউ সামনে এসে পড়লে থেমে যায়। ও নিজেও জানেনা, কিসের ওর এত অস্বস্তি। টিভিতে সিরিয়ালের নেশা নেই বন্যার। তবে গানের কোন অনুষ্ঠান হলে পারতপক্ষে ছাড়ে না। এখন তো বেশ মজাই চলে।শাশুড়ি এক ঘরে সিরিয়াল দেখেন। অন্য ঘরে শ্বশুর আর বউমা মিলে গানের অনুষ্ঠান দেখে। মিনি সে সময় খেলা করে।

তখনই একদিন সমরবাবু বন্যাকে বলেন আবার নতুন করে গান শুরু করতে।গত বছর বাপের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম, তানপুরা সব এনেছে। বন্যার মা খুব খুশি।
"যা নিয়ে যা।বাবার জিনিসগুলোর মূল্য দে তুই।"

কিন্তু, অলসতা যেন পেয়ে বসেছে বন্যাকে।গানের সরঞ্জাম সারানো হয়েছে। প্রথম ক'দিন খুব আগ্রহ নিয়ে রেওয়াজও করেছে। কিন্তু, সেভাবে যেন আর গানে ফিরতে পারছেনা বন্যা।

আজ সকাল থেকে মনের ভেতর কান্না পুষে রেখেছে। কাউকে বলেনি আজকের দিনের বিশেষত্ব। স্বামী অভিষেক অফিস যাবার পর মিনিও স্কুলে চলে গেল। সমরবাবুর

অভ্যাস প্রতিদিন বাজারে যাওয়া।বেলা দশটায় বাজার থেকে ফিরেই হাঁক পাড়লেন,
"বৌমা, কি এনেছি দেখ।জমিয়ে লাউ চিংড়ি রাঁধ আজকে।"

বলেই থলে থেকে বেশ বড় একটা লাউ আর কুঁচো চিংড়ির প্যাকেট বের করলেন।তারপরই শুরু করলেন,

"স্বাদের বলিতে তোমায়
সাধ জাগে মনে
আহা! কি মধুর সখ্য তোমার
চিংড়ি মাছের সনে।"

"ওমা! চিংড়িগুলো যে বাছাও নেই। বন্যা কিছু বলে না তাই।এত বেলায় চাড্ডি বাজার এনে রান্নার ফরমাশ করা।বলিহারি তোমায়।"

বন্যা তার শাশুড়িকে ঠান্ডা করে নিজে রান্নাঘরে ঢোকে। সিঙ্কে চিংড়িগুলো বেছে নেয়। তারপর বঁটিতে লাউটা দু ফালি করতে গিয়ে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না।দু চোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা।রান্নাঘরে কেউ নেই।

বেশ খানিকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে শান্ত হয় বন্যা। ধীরে ধীরে লাউটা কেটে যত্ন করে লাউ চিংড়ি রাঁধা শুরু করে।

ছোটবেলায় বাবা তাকে গানের তালিম দেওয়ার সাথে সাথে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অনেক কিছু বোঝাত। একবার একটা বড় লাউ কিনে এনে বন্যাকে বলেছিল,

"খাদ্য থেকে বাদ্য
লাউকে তুচ্ছ করে,কার সাধ্য।"
"এই লাউ যে সে জিনিস নয়। শুকনো লাউয়ের খোলে কত বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়। তবলা-বায়া, তানপুরা লাউয়ের বাই প্রোডাক্ট। বড় বড় সেতারে তো দুটো লাউয়ের খোলও লাগে।"

আজও যে ভেসে আসছে বাবার সেই গলা।
দুপুরে বাটি সাজিয়ে লাউ চিংড়ি দিয়ে শ্বশুরমশাইকে খেতে দিলেও নিজে খেল না কিছুতেই। বলল শরীরটা ঠিক নেই। শুধু ঘরে পাতা দই দিয়ে দু গাল ভাত খেল। আসলে আজকের দিনে কিছুতেই লাউয়ের তরকারি বন্যার গলা দিয়ে নামবে না।

শাশুড়ি এলার্জির কারণে চিংড়ি খান না।
দুপুরে সমরবাবু নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন বন্যাকে।ওর শাশুড়ি তখন ছাদে রোদ পোহাচ্ছেন।
"তোমার কি হয়েছে বৌমা। আমার কাছে কিছু লুকোবে না কিন্তু।"

অবাক বন্যার উত্তর,
"কই কিছু হয় নি তো।"
"আমার কাছে মিথ্যে বলে পার পাবে ভেবেছ।"
আর বাঁধ মানল না বন্যার। হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠল।
"আজ আমার বাবার মৃত্যুদিন।"
"হুঁ, যখনই লাউ চিংড়িতে দু বার নুন পড়েছে, তখনই বুঝেছি। মনটা বিক্ষিপ্ত তোমার।"

"সেকি বাবা, আপনি তখন চেটেপুটে খেলেন! অথচ কিছু বললেন না।"

"নয় নুনটাই দুবার পড়েছে। তাতে কি।যদিও আলাদা করে বলার বিষয় কিছু নয়, তবু আজ সকালেই তো বলতে পারতে বৌমা তোমার আজ মন- ভারের দিনটার কথা।

হালকা হতে অন্তত। সকালে পায়ে যে চোট পেয়েছ, ব্যাথা আছে কি!"

বন্যা কি বলবে ভেবে পায় না।তারপর লাউ নিয়ে তার বাবার সাথে যে মধুর স্মৃতি তা শ্বশুরমশাইয়ের কাছে গড়গড়িয়ে বলে ফেলে।
সমরবাবু বলেন,

"আজ তোমায় কোনভাবেই লাউ চিঙড়ি খাওয়ার কথা বলব না। তবে এটুকু বলব, যদি তুমি তানপুরাটা ধরে একটা গান গাও সেটাই হবে তোমার সঠিক
পিতৃতর্পণ। "

বন্যার শাশুড়ি ছাদ থেকে নেমে দেখেন, তানপুরা বাজিয়ে চোখ বুজে গান ধরেছে এক গায়িকা আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুনছে এক শ্রোতা।

কালো গোলাপ

দেবযানী দত্ত

সত্যসুন্দর তিনটি গোলাপ ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছবিটার সামনে রেখে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, " দেখ প্রিয়া, আজ আমি তোমার পছন্দের কালো গোলাপ তোমায় দিতে পেরেছি। আজ আর আমাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই যে। আমি পেরেছি, আমি পেরেছি।"
পুত্রবধু রুমি এগিয়ে এসে হাতটা ধরে সত্যসুন্দরের।

"বাবা, আমি বিয়ে হয়ে এসে থেকে দেখছি আপনার হাতে জাদু আছে। যে গাছেই হাত দেন সে কথা বলে ওঠে। কত ফুল ফুটিয়ে, ফল ফলিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন আপনি। কিন্তু, এমন আনন্দের প্রকাশ আগে তো কখনো দেখিনি।"
সত্যসুন্দর চেয়ার টেনে বসেন। রুমিকে এক গ্লাস জল আনতে বলেন। রুমি জল আনতে পা বাড়ালে স্ত্রী প্রিয়ম্বদার ছবির ওপর হাত বুলিয়ে বলেন, " দুটো কালোর মধ্যে একটা লাল গোলাপ রইলো। সংস্কার মন থেকে দূর করতে

পেরেছি আমি। কিন্তু, লাল গোলাপ তোমার খোঁপায় এত মানাত যে, ওটা না দিয়ে থাকতে পারলুম না।"
রুমি জল নিয়ে এলে, ঢকঢক করে জলটা শেষ করলেন সত্যসুন্দর। তারপর রুমিকেও আরেকটা চেয়ার টেনে বসতে দিলেন।

"তোমার শাশুড়িমায়ের যে কোন গোলাপ খুব পছন্দের ছিল। তাই আমি যেখানে যত রকমের গোলাপের চারা পেতুম, এনে টবে লাগিয়ে তার যত্ন করতুম। গাছে জল দিতে দিতে বলতুম কবে তুমি ফুল দেবে। সেও চুপিসারে আমায় বলত, ' খুব শিগগির '।"

রুমি হেসে ফেলে বলে, " আপনি যে গাছেদের সাথে কথা বলেন, তা আমি জানি বাবা। আমি আড়ালে থেকে বহুবার দেখেছি। আপনি কিভাবে সন্তানস্নেহে গাছের পাতাগুলোতে হাত বুলোন। ফিসফিস করে কি যে বলেন, শোনার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারি নি। "

সত্যসুন্দর আবেগকে প্রশমিত করতে পারেন না।
" হ্যাঁ মা, এটা শুধু জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার নয় গো, আমি সত্যি টের পাই গাছের হৃদস্পন্দন। মাটির রস নিঙরে শুষে

ওরা শুধু জীবনধারণই করে না, তার বদলে সে তার রূপ - রস-গন্ধ সব ছড়িয়ে দেয় আকাশে বাতাসে মাটির শিরায় শিরায়। "

রুমি অজান্তেই তার চোখের কোল বেয়ে নেমে আসা দুফোঁটা অশ্রু মুছে বলে,

"আপনি গাছেদের হৃদয় দিয়ে বোঝেন বলেই না, তারা কখনো আপনাকে ফেরায় না। ফুলে ফলে ভরে থাকে আমাদের ছোট বাগান।"

হঠাৎই সত্যসুন্দরের মুখটা গম্ভীর হয়।
" না মা, একজন আমায় ফিরিয়েছিল। প্রিয়ম্বদার খুব শখ ছিল কালো গোলাপ দেখবে- ব্ল্যাক প্রিন্স। আমার কাছে আবদার করত কালো গোলাপ গাছ লাগানোর জন্য। কিন্তু, আমার মনে একটা অদ্ভূত কুসংস্কার ছিল।কালো গোলাপ মৃত্যুর প্রতীক, বিচ্ছেদের প্রতীক। তাই আমি কখনো কালো গোলাপ ফুটুক এ বাড়িতে চাই নি।তবু ওর কথা ফেলতে না পেরে একবার কালো গোলাপের চারা অনেক দাম দিয়ে কিনে এনেছিলুম। যত্ন করতে ত্রুটি করিনি। কিন্তু, সে গাছ

বাঁচল না। তোমার শাশুড়ি মায়ের বড্ড আফসোস হয়েছিল। আর আমি আড়ালে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি।"

রুমি আগ্রহ দেখায়,
"আচ্ছা বাবা, আমি শুনেছি বাস্তবে কালো গোলাপ বলে কিছু হয় না। আসলে লাল বা মেরুন রঙটাই এতটা গাঢ় হয় যেটাকে কালো বলে ভ্রম হয়।" পুত্রবধুর আগ্রহে খুশি হয়ে সত্যসুন্দর বলেন, "তুমি খুব ভুল কিছু বলোনি মা। সারা পৃথিবীর মধ্যে ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বকূলে তুরস্কের হালফেতি গ্রামের মাটিতে একমাত্র কালো গোলাপ জন্মায়। সে তো আলাদা। কিন্তু, আমরা যে প্রজাতির গাঢ় রঙের গোলাপকে কালো গোলাপ বলে জানি, সেটা যত্নে অবশ্যই ফুল দেয়। বহু চেষ্টায় যা ফুটিয়ে আজ দুটো তোমার শাশুড়ি মায়ের ছবির সামনে রেখেছি।"

রুমি সযত্নে ছবির সামনের কালো গোলাপ দুটোতে হাত বুলিয়ে দেয়।

সত্যসুন্দরের এখন আটষট্টি বছর বয়স। আট বছর আগে তার স্ত্রী মারা যান। তখন থেকে সত্যসুন্দর আরও বেশি করে মেতে ওঠেন গাছেদের নিয়ে। কত রকমের যে ফুল

ফল ফলান। অবাক হয়ে যায় সবাই দেখে। এবারেই পুজোর আগে ছোট চৌবাচ্চায় কাদা, ছোট মাছ, সবকিছুর সাহায্যে ফুটিয়েছেন পদ্ম। যেখানে যত গাছের প্রদর্শনী হয়, সত্যসুন্দরের গাছ থাকবেই। প্রিয়ম্বদা চলে যাওয়ার পরের বছরই একমাত্র ছেলের বিয়ে দেন। রুমি এখন তার পুত্রবধু নয় মেয়ে। মনের মত সাথী পেয়েছেন তাকে। বাবা মেয়েতে সারাদিন মেতে থাকে নানান বিষয়ে। রুমির একটা গানের স্কুল আছে। কিন্তু, যখনই সময় পায়, পিতৃসম শ্বশুরমশাই কে সাহায্য করে গাছপালার যত্নে। তবে, একটা বিষয় ভীষণ মনমরা হয়ে থাকে রুমি। সাত বছর বিয়ে হলেও এখনও তার কোন সন্তান হোলো না। সত্যসুন্দর বোঝেন, রুমির একটা সন্তানের জন্য মনের তাগিদ খানা। বহু ডাক্তার দেখিয়ে, টেস্ট করে শরীর জর্জরিত হয় রুমির। চোখে জল ভরে রুমি যখন ঘরের কাজ সারে, সত্যসুন্দর তখন গ্ল্যাডিওলাস গুচ্ছ এনে বলেন,
"নাও ফুলদানিতে সাজাও।"

কোন গাছে প্রথম ফুল ফুটলে সত্যসুন্দর বরাবর সেটা এনে প্রিয়ম্বদাকে উপহার দিতেন। এখনও দেন ছবির সামনে। আর দ্বিতীয় ফুলটি উপহার দেন রুমিকে। কালো গোলাপেও ব্যতিক্রম ঘটল না।

সত্যসুন্দর চেয়ার থেকে উঠে রুমিকে হাত ধরে নিয়ে এলেন বাগানে। কালো গোলাপের গাছটার সামনে এনে বললেন,

"মা দেখেছ, কত গুলো কুঁড়ি এসেছে। এবারে যে ফুল গুলো ফুটবে সেগুলো তোমার। ইচ্ছে হলে তুলো, না হলে গাছেই রেখে তাদের রূপ রস গন্ধ অনুভব কোর।"

গত কয়েক বছর শীত কালে এক বড় ফুলের প্রদর্শনীতে যোগদান করেন সত্যসুন্দর। এবারে দিয়েছেন কালো গোলাপের টবটা। যে দেখেছে বিস্মিত হয়ে গেছে। গাছটায় একসাথে এত গুলো কালো গোলাপ! কি তার রূপ!
সেরা গাছের একটা পুরস্কার দেওয়া হয় গাছের মালিককে। প্রদর্শনী শেষে এবারের সেরা পুরস্কার পেলেন সত্যসুন্দর তার কালো গোলাপ গাছটার জন্য। সন্ধ্যেবেলা তিনি তার কালো গোলাপ গাছ আর পুরস্কারের ট্রফি নিয়ে বাড়ির সামনে গাড়ী থেকে নামলেন, ছুট্টে এল রুমি। সত্যসুন্দরকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতরে ঢোকালো। কালো গোলাপ গাছটার টব আর ট্রফিটা নামিয়ে নীচু হয়ে প্রণাম করল রুমি।

"আজ আপনাকে আরও একটা সুখবর দেব বাবা। এতদিনে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আজ ডঃ চৌধুরী আমার টেস্ট করে বললেন পজিটিভ।আমি মা হতে চলেছি।"

সত্যসুন্দর দু'হাত তুলে চিতকার করে উঠলেন,
"আহ্ কি আনন্দ! এক নতুন আশা আর আনন্দের শুরু হল। ও রে মা, আমি যে ভুল কিছু করিনি। আজ কালো গোলাপের হাত ধরে এ বাড়িতে নতুন প্রজন্মের সূচনা হল। কালো গোলাপ শুধু মৃত্যুর প্রতীক নয়, সে যে নতুন প্রজন্মের আগমনের বার্তাবাহক। "

সত্যসুন্দর আরো কত কত রকমের ফুলের গাছ কিনে এনেছেন। আদর যত্নে তাদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করছেন। আর রুমি সারাদিন ছোট্ট দুষ্টুটার পেছনে দৌড়ে অস্থির। মায়ের বকুনি খেয়ে দুষ্টুটা গিয়ে ঠাকুরদার কাছে লুকোয়। আর সত্যসুন্দর মনের আনন্দে নাতিকে বিভিন্ন গাছ চেনাতে থাকেন। এখন তার বাগানে বেশ অনেকগুলো কালো গোলাপ গাছ আছে। দূর দুরান্ত থেকে লোক দেখতে আসে সেই অপূর্ব বাগান। সত্যসুন্দর ভাবেন, এই তো শুরু। আরও কত কত গাছ লাগানো এখনও বাকি। তাদের জীবনীশক্তি প্রাণ ভরে নিতে হবে। এই তো সবে শুরু।

শিল কাটাও

দেবযানী দত্ত

"যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া। দূর হ! দূর হ!"

" ঠিক আছে, দূর হতে বলছ দূর হচ্ছি।কিন্তু, আমিও দেখব কে তোমার জাঁতি দিয়ে মিহি সুপুরি কুঁচিয়ে দেয়।"
" আমার চাই না সুপুরি। অন্তুর জন্য করা আচার কিনা এঁটো করে দিলি! বের হ চোখের সামনে থেকে।রোজই এটা ওটা চাস, আর আমি দি।আর লুকিয়ে কিনা আচার খাবি!"

এদিকে যখন কুরুক্ষেত্র লেগেছে,তখন ওদিকে রান্নাঘরে অন্তুর মা অন্তুর বউ পিয়ালীকে শুক্তোয় কি ফোড়ন দিতে হয় বোঝাতে ব্যস্ত।

"ওই লাগল আবার শেফালীর সাথে। কেন যে মা বোঝেননা এখনকার দিনে কাজের লোক পাওয়া কত সমস্যার। "
পিয়ালী এলাহাবাদের মেয়ে।দু মাস হল অন্তুর বউ হয়ে এসেছে। একমাত্র নাতি হিসাবে অন্তুকে বাড়ির সবাই হাতের তালুতে রাখে। সেই সুবাদে পিয়ালীও আদর যত্ন পায়।তবে পিয়ালী বাঙালিয়ানা, বিশেষত বনেদি বাঙালিয়ানা সম্বন্ধে

একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। তার শাশুড়ি উঠে পরে লেগেছে তাকে বাঙালিয়ানা শেখাতে।

পিয়ালী বলে ওঠে,

" মা, ঠাকুমা কি শিল নোড়ার কথা বলল।"

"আরে ওটা কথার কথা। উপকার স্বীকার না করে কেউ যদি ক্ষতি করে, তাকে এমন বলা হয়। "

" ও আচ্ছা। কিন্তু শিল নোড়া কি জিনিস। "

" হায় রে কপাল! তুমি তো আবার সে সব জান না। আচ্ছা, এ বাড়িতে যেদিন এলে, বিয়ের আচারে একটা বড় পাথরের টুকরো দেখেছিলে? চারপাশে কলাগাছ পোঁতা।"

"হ্যাঁ, দেখেছি তো। কত্ত বড়। ওতে তো মশলা বাটে।তবে আমাদের বাড়িতে ছিল না। রামদীন গয়লার বউ দেখেছি এত্ত লঙ্কা বাটত।"

"অ, তাহলে জান তো। আগে আমাদের বাড়িও ওতেই বাটনা বাটা হোত। অন্তর ঠাকুমা কম ডাল বাটিয়েছেন আমায়! তবে গয়না বড়ি খুব ভাল দিতেন। অন্ত যখন স্কুলে, আমার ডান হাত চিড় খেল পড়ে গিয়ে। তোমার শ্বশুর মিক্সি কিনে আনল। ব্যস! সেই থেকে এ বাড়িতে শিল নোড়ার পাট চুকেছে।"

" বিয়ের সময় যেটা দেখেছি, অত বড়টায় কি করে বাটতেন।"

অন্তুর মায়ের হাসি ধরে না।

"ওটা শুভ আচারের জন্য। রান্নার কাজে ওর থেকে ছোট ব্যবহার হোত। আমি কম বাটনা বেটেছি নাকি। আমরা পেরেছি, তোমরা এখনকার মেয়ে বউরা অত খাটতে পারবে না।"

দুপুরে পিয়ালী ঠাকুমার ঘরে এল।কি সুন্দর ছাঁটা ফুলের আসন বানাচ্ছেন উনি দেখার মতো। রঙ মিলিয়ে চটের ওপর উল কেটে কেটে নিখুঁত ভাবে ফুল বানাচ্ছেন। পিয়ালী মুগ্ধ।শিল নোড়ার কথা তুলতে অন্তুর ঠাকুমা বলতে থাকেন

" সে সোয়াদ কোথায় এখন রান্নায়। বাটা মশলায় রান্না আর গুঁড়ো মশলায় রান্নায় কত ফারাক।"

" এ বাড়িতে আছে না শিল নোড়া!"

"আছে তো। ভাঁড়ার ঘরে এক কোনায় আছে নিশ্চয়ই। কেন রে নাতবউ, তুই মশলা বাটবি নাকি?"

"কখনও করিনি, তবে ইচ্ছে আছে।"

পরদিন শেফালীকে দিয়ে ধুলো ঝাড়িয়ে শিল নোড়া বের করলেন অন্তুর ঠাকুমা।

শেফালী বলে,

"কি গো আমার দাঁত ভাঙবে বলে বের করছ নাকি।সেই তো আমি ধান ফেলতে ভাঙা কুলো।"

পিয়ালী অবাক হয়ে যায়। কুলো আবার কি। অন্য কোনদিন জেনে নিতে হবে।

সারা দুপুর বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। পিয়ালী একবার সর্ষে, একবার আদা সব নিয়ে বাটার চেষ্টা করছে। অন্তুর মা আর ঠাকুমা পেরে ওঠে না মেয়েটাকে নিয়ে। কয়েকবার হাতে লাগল। চোখ জ্বলছে ঝাঁঝে।তবু পিয়ালী শিখবেই বাটনা বাটা, ছাড়ার পাত্রী সে নয়।

"এ শিল যে একবারে ঘসে আছে।শিল না কাটালে বাটা তো যাবেই না।"

" অ্যাঁ, সে আবার কি?"

" হ্যাঁ গো পিয়ালী, ঠাকুমা ঠিক বলেছেন। শিল পাটা কাটা একরকমের পেশা। ওরা বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে শিলের গায়ে দাগ করে দেয়। কত রকম ছবি ফুটে ওঠে তাতে। কখনো মাছ, কখনো ফুল,পাখি। তবে সেই শিলে ভাল বাটনা বাটা যায়। কিন্তু সে লোকের যে আজ বড় অভাব। কাজ কোথায়। ঘরে ঘরে যে মেশিন আছে।"

ক'দিন বাদে মোড়ের মাথায় একটা সুরেলা হাঁক শুনে ছুটে বারান্দায় যায় পিয়ালী।

"শিল কাটাও, শিল পাটা কাটাও...."

অন্তুর মা শেফালীকে দিয়ে সেই লোককে ডাকিয়ে আনে।একমাত্র পুত্রবধূর সংসারের কাজে এত আগ্রহ দেখে মনে মনে তারিফ করেন।

পুরনো শিল নোড়ার ওপর লোকটা বাটালি, ছেনি দিয়ে ছোট হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ফুটিয়ে তোলে মাছের নকশা।মাছের গায়ের আঁশগুলো কি অদ্ভূতভাবে ফুটে ওঠে পাথরের টুকরোটায়। পাথরে আঘাতের ফলে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের ফুলকি বেরোয়। বাতাসে মিশে যায় পাথর পোড়া বারুদের গন্ধ।

তিন প্রজন্মের তিন নারী ঘিরে থাকে লোকটার চারপাশে।

পরদিন রবিবার দুপুরে অন্তু আর অন্তুর বাবা মাথা নেড়ে নেড়ে পোস্তবাটা দিয়ে ভাত মেখে খেল। পিয়ালীও খাচ্ছে আর আড়চোখে দেখেছে। অন্তুর মা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

" পিয়ালী নিজে কাঁচালঙ্কা, পোস্ত বেটেছে শিলে। প্রথম চেষ্টাতেই সফল। "

সবার আদরের অন্তুর মুখে একগাল হাসি।

" তাই বলি, এত সুন্দর পোস্তবাটা তো বহুকাল খাইনি। আর এক হাতা ভাত দাও মা।"

পুঁটি
দেবযানী দত্ত

পুঁটি চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে মেঝের বিছানায় শুয়ে ভাবল, " এ দাদাবাবুর চরিত্তির নিশ্চয় খারাপ। রোজ রোজ এত রাত অবধি কোলের ওপর মেশিনটা নিয়ে কি করে শুনি। হুঁ হুঁ বাবা, আমিও সাতঘাটের জল খাওয়া পুঁটি, সব বুঝি। সাবধানে চলতি ফিরতি হবে।"

অর্পন আর সায়নী দুজনেই চাকরি করে। বার বছর বিয়ে হলেও কোন সন্তান হয় নি।সে নিয়ে অবশ্য দুজনেই তেমন খুব একটা চিন্তিত নয়। বরং যে যার কাজের জগতে এমনই ব্যস্ত থেকেছে যে তেমনভাবে সন্তানের চেষ্টাও কখনো করেনি। এখন তারা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে এবং নিজেদের মত করে সুন্দর সময় কাটায়। পুতুলদি নামে একজন ওদের সংসার সামলাত।তবে তার বয়স হতে, ছেলে আর কাজ করতে দেয়নি। ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তবে পুতুলদি ওদের এতটাই আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল যে, যাবার সময় হাপুস নয়নে কেঁদেছে ও দাদা বৌদির অসুবিধের কথা ভেবে তার দেশেরই একটি মেয়ে পুঁটিকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

পুঁটির বয়স এখন সতের। গত দু বছরে সে কলকাতার তিনটি বাড়িতে কাজ করেছে। তার গাঁয়েরই কেউ না কেউ

কাজ জুটিয়েছে এবং পুঁটি সব জায়গাতেই অসুবিধের কারনে কাজ ছেড়েছে।

পনের বছর বয়সে প্রথম যে বাড়িতে কাজে লাগে, সেখানে তার খাওয়া দাওয়ায় সমস্যা হল।একেই উঠতি বয়স তার উপর গাঁয়ের জল হাওয়ায় সুস্থ সবল শরীর। খিদে তার কিছু বেশি। দু বেলা ভাত সে ভাল পরিমাণে খায়। সে তুলনায় তার মোটেও খাওয়া জুটছিল না।লজ্জায় কিচ্ছু বলতেও পারত না।

কাজ ছেড়ে মাকে বলল,

" ছ্যা! কলকেতার লোক অমন পাখির আহার করে? জানা ছিল না বাপু।"

দ্বিতীয় বাড়িতে খাওয়া দাওয়া বেশ ভালই। তবে তিন ভাইয়ের এক সংসার। বাপ রে বাপ! পাঁজা পাঁজা বাসন আর ফরমাশের অন্ত নেই। তার উপর বৌদের যা চোপা!

তিন নম্বর বাড়ি এমনি ভাল ছিল। কিন্তু কর্তার চাউনি মোটে ভাল না।তার ওপর তাদের এক ছেলে হোস্টেল থেকে বাড়ি এল। রাত দুপুর পর্যন্ত জেগে কোলে একখান মেশিন নিয়ে খুটুরখাটুর করত।তেনার রাতে কফি খাওয়ার শখ জাগত।পুঁটি কফি দিতে গিয়ে দেখেছে,

ম্যাগো! ওই ল্যাপটপ না কি, ওতে কি অসভ্য সব ছবি দেখছে ছেলেটা। পুঁটিও অবশ্য মাঝে মধ্যে জানলায় উঁকি

মেরে দেখার চেষ্টা করত। তবে এক রাতে ওই ছেলে পুঁটিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখে ঘরে ডেকে নিয়ে যায়।তারপর তার হাত ধরে টেনে বলে, " আয় একসাথে দেখি।"
আহা! ভারি আবদার! পুঁটি যেন বাজে মেয়ে।এক থাবড়া ছেলেটার গালে। লজ্জায় ছেলেটা বাড়ির লোক ডাকেনি অবশ্য। যাইহোক পুঁটি পরদিনই কাজ ছাড়ে।তার মাসখানেক বাদে পুতুলমাসি এ বাড়িতে ঢোকাল।

দাদা বৌদি মানুষ খারাপ না। ভাল খাওয়া পরা।তাকে একটা ঘরের ছোট খাটেই শুতে বলেছিল। বাব্বা! কি নরম বিছনা! ওতে শুলে পুঁটির ঘুমই আসে না। একখান মাদুরই যথেষ্ট। কিন্তু, বৌদি শোনেননি। একখানা কম্বল, বালিশ সব দিয়েছে।
দাদা বেশ রসিক মানুষ। প্রথম দিনই ওকে দেখে ছড়া কেটেছিল, " পুঁটি আমার পুঁটি রে, রাধনা কটা পুঁটি রে।"
বৌদি হেসে বলেছিল, " তোর দাদাবাবু বড্ড পুঁটিমাছের ঝাল খেতে ভালোবাসে। আবার তোর নামটাও দ্যাখ পুঁটি।"
দাঁত বের করে হেসেছে পুঁটি।

বৌদি বলে," পুতুলদি মাঝে মাঝে রেঁধে দিত।আর আমি কোথায় সময় পাই বল।অত ছোট মাছ, বাছ- রাঁধ, বাপ্ রে বাপ্।"

পুঁটি বলেছিল, " তুমি চিন্তে কোর না বৌদি।আমি রেঁধে দেবোখন। "

তা পুঁটি হাল ধরেছে বৈকি। শুধু পুঁটি কেন,ছোট যে কোন মাছ আনলেই পুঁটি দিব্যি বেছে ধুয়ে ভালোই রাঁধে।

কিন্তু, ওই পুঁটির মনে বিরাট সন্দেহ। যে মানুষ পাশের ঘরে বৌ ঘুমোচ্ছে আর সে সোফায় বসে মেশিনে খুটখুট করে সে ক্যামন তারা। আর পুঁটি তো আগের বাড়িতেই দেখেছে, ওই মেশিনে কত খারাপ খারাপ ছবি থাকে। পুঁটি ভাবে,এদের ছেলে পিলে নেই তো, তাই এমন বেখাপ্পা এরা। বর রাত দুপুর অবধি জেগে কি সব করছে, আর বৌ দিব্যি ঘুমোচ্ছে। তাদের গাঁয়ে এমন ধারা নয়। আবার পুঁটি এটাও ভাবে, আহা গো! দেশে রতনদার বৌটার কি জ্বালা! বাচ্চা হয়নি বলে সবাই বাঁজা বলে কি খোঁটাটাই না দ্যায়। তবু এই বৌদিকে ওসব তো শুনতে হয় না। রক্ষে!

এর মধ্যে সায়নীর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ল।তাকে বাপের বাড়ি যেতে হল।অর্পন বলল, সে কটা দিন ঠিক সামলে নেবে।আর পুঁটি তো আছেই। সে আশ্বাস দিন,

" বৌদি তুমি বাপের ঘর থেকে ঘুরে এস।চিনতে কোর না। ও আমি দুটো দিন পারবখন "

পারব তো বলেছে।কিন্তু, রাতেরবেলা পুঁটির বুক কাঁপছে। যদিও ঘরের দোর ভেজিয়ে শুয়েছে।তবু ফাঁক দিয়ে সমানে দাদাবাবুকে লক্ষ্য রাখছে।মেশিনে অত খুটুরখাটুর করা কেন রে বাপু! যা না ঘরে গিয়ে শুলেই তো হয়। পুঁটিও আস্তে করে ছিটকিনি তুলে ঘুমোবে।নিশ্চিন্তি হবে। তা না সোফায় বসেই আছে।এদিকে পুঁটিও ভয়ে দুচোখ এক করতে পারছে না। এর মধ্যে পুঁটি এক কাণ্ড করেছে।লুকিয়ে আঁশবঁটিখানা বিছানার পাশে রেখেছে। যদি কিছু বেগড়বাঁই

দেখে, দেবে কোপ বসিয়ে।না বাবা সাবধানের মার নেই। আগের বাড়ির ছেলেটা যেরাম ব্যাভার করেছে!

রাত বোধহয় দুটো হবে। একটু চোখ লেগেছে পুঁটির। এমন সময় অর্পন 'পুঁটি পুঁটি' বলে একেবারে ঘরের মধ্যে। ব্যস আর যায় কোথায়। পুঁটি একেবারে বঁটিখানা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, " আর এগোবেনি বলছি।"

অর্পন পুরো হতভম্ব। ওদিকে পুঁটি বলে চলেছে,

" আমি জানি, ওই মেশিনে এতক্ষণ বাজে ছবি দেখছিলেন।এখন এখেনে এয়েছেন।"

পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেল অর্পন।

"বঁটিটা নামা শিগগির। দুনিয়ায় কি সবাই খারাপ রে! এসে দ্যাখ, এ মেশিনে শুধু ছবি থাকে না। অনেক কাজ করা যায়। তোর বৌদি থাকতেও তো দেখেছিস,আমি রোজ রাতে ওই মেশিনে অফিসের অনেক কাজ সারি রে।"
পুঁটি ল্যাপটপের সামনে এসে দাঁড়ায়।কোথায় ছবি! এতো শুধুই লেখা আর লেখা। ছি! এত দিন কি ভুলটাই না ভেবে এসেছে পুঁটি।
কেঁদে আছড়ে পড়ে অর্পনের পায়ে।
অর্পনের বেশ জ্বর এসেছিল, তাই পুঁটিকে ডেকেছিল ওষুধের বাক্স এনে দেবার জন্য।আর কি হল!
পুঁটি সারারাত জেগে দাদাবাবুর মাথায় জলপটি দিল।মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।জ্বর ছাড়তে অর্পন ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে পুঁটি জলভরা চোখে অর্পনের সামনে এসে বলল,
" আমি হতচ্ছাড়ি মেয়ে দাদাবাবু। আপনারে ভুল বুঝেছি। আমি আজই দেশে চলে যাব।বৌদিরে মুখ দেখাতি পারব না। "
অর্পন হাসতে হাসতে বলে,
" যাব বললেই যেন যেতে দিচ্ছি আমি। তোর এই অহেতুক ভয়ের কথা আমি সায়নীকে বলব না। শুধু বলব, আমার কাছে এই সোনা মা পুঁটিকে রেখে গেছিলে বলেই না শরীর

খারাপে আরাম পেয়েছি। বিশ্বাস কর, কাল রাতে তুই যখন মাথায় হাত বুলোচ্ছিলিস আমি ভেবেছি আমার মায়ের হাত বুঝি।তাছাড়া তুই চলে গেলে আমায় পুঁটির ঝাল কে খাওয়াবে শুনি।"

লজ্জায় লাল হয়ে একগাল হেসে রান্নাঘরে ঢোকে পুঁটি।

দেবযানী দত্ত

'বিনোদিনী ওয়েডস্ বিনোদ' - লেখাটা পড়ে পরেশের সাইকেলের প্যাডেলে চাপ মারা থেমে গেল। পালভিলার উল্টোদিকের পুরনো একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে সাইকেলটা ঠেসিয়ে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল পরেশ। কী অপূর্ব সাজিয়েছে বাড়িটা। এমন ফুলের কাজের বাহারি গেট শুধু পরেশ কেন মোহনপুরের অনেকেই দেখে নি। পাশের কস্মেটিক্সের দোকানে মাল সাপ্লাই দেয় যে রাজু বলছে, কলকাতায় কোন এক নায়িকার বিয়েতে মামার সাথে ফরমাশ খাটতে গিয়ে দেখেছিল। পরেশের মুখের হাঁ আরও বড় হয়। নায়িকাদের তো স্বপ্নেই দেখা যায়। বিনোদিনীর সাথে পাশাপাশি বেড়ে উঠলে কি হবে, যত বড় হল বিনোদিনীর রূপ ফেটে পরতে লাগল। ওই রূপ তো সিনেমাতেই দেখেছে পরেশ। যারা নায়কের সাথে নেচে নেচে গান গায়। আর সত্যি তো বিনোদিনী আজ বহুদিন পরেশের কাছে স্বপ্নের নায়িকাই হয়ে গেছে। কাগজ কলের কেরানী পরেশের জীবন এক জায়গায় স্থির।

মোহনপুর কলকাতার খুব কাছের একটা শহরতলী। পাশাপাশি বাস করা মধ্যবিত্ত পরিবারের দুটো ছেলেমেয়ে পরেশ আর বিনোদিনী ছোটবেলায় একসাথেই মানুষ। পরেশ একবার কাঁচি দিয়ে বিনোদিনীর চুল কেটে দিয়েছিল। বাধ্য

হয়ে বিনোদিনীকে তার মা নাপিত ডেকে ছোট ছোট করে ছেলেদের মত চুল করে দেয়। বছর তের - চোদ্দর পরেশ দুঃখ করে বলেছিল,
"আর কক্ষনো করব না এমন। বড় চুলে কি সুন্দর লাগে তোমাকে দেখতে। এখন ছেলে মনে হচ্ছে একেবারে।"
বিনোদিনী পরেশের কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে চোখ টিপে বলেছিল, " আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। ছেলেদের মত সাজগোজ আমার খুব পছন্দ। "
পরেশ চমকে গিয়ে বলেছিল, " এ বাবা তুমি চোখ মারতে পার!"

মাধ্যমিকে মোহনপুরে সেরা রেজাল্ট করা বিনোদিনীকে তার দূর সম্পর্কের মামা কলকাতায় নিয়ে গেল। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। বিনোদিনীর বাবা মা দুই ছেলেকে নিয়ে রয়ে গেলেন। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল নিঃসন্তান মামা যখন ভার নিচ্ছেনই তখন দুই ছেলেকেই তো নিতে পারেন। মেয়ে যতই বিদ্যেধরী হোক, তাকে বিয়ে দিয়ে পার করা যাবে। ছেলে দুটোর গতি হলে বরং ভাল হোত। কিন্ত, মামা নিম্নমেধার দুই ভাগ্নেকে ছেড়ে প্রখর বুদ্ধিমতী বিনোদিনীকেই নিয়ে গেলেন। মামী বেশিদিন বাঁচলেন না। মামাই

বিনোদিনীকে শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক এবং মানসিক দিক থেকে এগিয়ে দিলেন।

ছুটিছাটাতে বিনোদিনী মোহনপুরে এলে মায়ের কোলে শুয়ে মায়ের আঁচলের গন্ধ নিত। পাড়া পড়শি বলত, " কলকাতার জল গায়ে পরে মেয়ে তো আরও রূপসী হয়েছে বউ। আঁটসাঁটো প্যান্ট জামা ছেলেদের মত না পরে কাপড় পরলেই তো হয়।"

মা তাকে বাবার কিনে দেওয়া সালোয়ার কামিজ পরতে বললে সে হেসে লুটোয়।

এক গরমের ছুটিতে বিনোদিনী এসেছে। রাতের বেলা তার বাবা মাকে জাগিয়ে বলে, " তোমার মেয়ে শিস দিয়ে ছাদে গান জুড়েছে। মেয়েছেলেতে এমন শিস দিচ্ছে শুনলে লোকে কি বলবে। "

বিনোদিনী নিজের চেষ্টায় পড়াশোনায় অনেক দূর এগোলো। বিদেশে পড়ার সুযোগ আসতে মামা তাকে বিদেশেও পাঠালেন। মা প্রথমে কেঁদেকেটে বলেছিল,

"যতই দূরে থাক দাদা, তবু তো জানি তুমি কাছে আছ। এ যে বিদেশ বিভুঁই। মেয়েটা একা একা সেখানে কি করবে।"
মামা হেসে বলে, " আরে তোর মেয়ে আস্ত বিশটা ছেলেকে এক হাত নেবে। এতবড় সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে।"
বিদেশ যাবার আগে বিনোদিনী মোহনপুরে এসেছিল যখন পরেশ তাকে দূর থেকে দেখেছিল। পুরো স্বপ্নের রাণীর জীবন ওর। কিন্তু, হাব ভাব বড্ড কাঠ কাঠ। একটু মেয়েলি হাঁটাচলা হলে বেশ হোত। সাথে দু তিনটে ছেলে বন্ধু ছিল।

বিনোদিনী বিদেশ থেকে ফেরার আগেই মামা মারা গেল। দেশে ফিরে বিনোদিনী বড় চাকরি পেল। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। সেটা দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের দান করল।এখন ও নিজেই অনেক টাকা রোজগার করে।কলকাতায় অবশ্য সে মামার বাড়িতেই থাকে একা একা।
বিনোদিনীর বাবা এবং ভাইয়েরা প্রায় তার বাড়িতে এসে থাকতে লাগল। তাদের বক্তব্য সে একা মেয়ে কি করে থাকবে। বহুদিন নিজের মত নিজে থাকা বিনোদিনীর কাছে বাবা ও ভাইয়ের খবরদারি অসহ্য মনে হতে থাকল। তার উপর অহরহ তারা বিয়ের চাপ দিতে থাকল। ওর প্রাত্যহিক জীবন যাপন কোন শান্ত মেয়ের মত নয়। সাজ পোশাক, আচরণ সবটাই অন্য।তার সাথে ধূমপান করে। বন্ধুদের

নিয়ে উইক এন্ড ট্যুর বা লেটনাইট পার্টি থেকে ফেরা স্বাভাবিক। বাবা ভাইকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারে না।
একদিন সকাল সকাল বিনোদিনীর এক ভাই ও বাবা এসে হাজির। তারা নাকি ডাক্তার দেখাতে এসেছে। ঘুম চোখে তাদের চা করে দিল বিনোদিনী। সে সময় ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে অন্য ঘর থেকে বেরোলো বিনোদিনীর এক পুরুষ বন্ধু। মুখে তখনই কিছু না বললেও সেই বন্ধু চলে যেতে ভাই বিনোদিনীর ওপর তেড়ে ফুঁড়ে গেল, " একা বাড়িতে ছেলে নিয়ে থাকিস! "

বাবা তার রোজগেরে মেয়েকে তেমন কিছু বলতে পারেন না। তবু তিনিও বললেন, " এ সব কি অন্যায়। "
ভাই কুতসিত ভঙ্গীতে বলল,
" বিদ্যের তো জাহাজ, ছলাকলা তো কিছু জানা নেই। তবু ছেলে বন্ধু রাতে ঘরে ছিল! "

বাবা ভাই ফিরে যেতে সেদিন রাতে বিনোদিনী বহুকাল বাদে অঝোরে দু চোখ ভাসাল। গঠনগত ও শারিরীক দিকে সে মেয়ে। হ্যাঁ, সুন্দরীও। কিন্তু, নিজে ও জানে কোন পুরুষকে কখনও স্বপ্নে দেখে না। পুরুষের স্পর্শে ও শিহরিত হয় না। বরং কোন সুন্দরী মেয়ে বন্ধুর সাথে সারাদিন কাটালে মনটা

ওর খুব ভাল থাকে। তার সাথে থাকার সময় বারবার সেই মেয়ের শরীর ছুঁতে ইচ্ছে করে। ওর মনে যে পুরুষ সত্তা সবসময় জেগে থাকে তাকে ঘুম পারাতে চাইলেও সে ঘুমোয় না যে। বাড়ির লোককে কি করে বোঝায়, পুরুষ বন্ধু ঘরে থাকলেও সে শুধুই তার বন্ধু। আর কোন সম্পর্ক সত্যি নেই। তার মধ্যে মেয়েলি স্বভাবের আকর্ষণ তার পুরুষ বন্ধুরা খুঁজে পায় না যে। মামার প্রশ্রয়ে বাইরের জগতটাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে বিনোদিনী এই ছেলে মেয়ের বিভেদ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। নিজের পেলব নারীশরীরের ভেতর যে পুরুষ সত্তা বাস করছে তাকেই সে লালন করে এখন।

পরের সপ্তাহে মা এল বাবার সাথে কলকাতায়। কান্নাকাটি করে বিনোদিনীকে অনেক বোঝাতে লাগল। মায়ের একটাই চাহিদা, সে যেন বিয়ে করে। তার পছন্দের ছেলেকেই যেন করে। মামা নেই, তাই মাথার ওপর তেমন অভিভাবক নেই।নিজেরা মোহনপুর নামক এক বিচ্ছিন্ন জায়গায় থাকে। তাছাড়া বিনোদিনীকে রক্ষার ক্ষমতাও তাদের নেই। বিনোদিনী যতই বোঝায় তার বিয়ের প্রয়োজন নেই। তারা ততই চাপ দেয়। মেয়ের একজন অভিভাবক তাদের চাই ই।

একমাস পর বিনোদিনী জানাল পাত্র রেডি। সে ধূমধাম করে বিয়ে করতে চায় আর সেটা মোহনপুরে। পাত্রের নাম বিনোদ। এছাড়া তার বেশি আর খোলশা করল না। বাবা আর ভাইদের হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দিয়ে বলল, তারা যেন বিয়ের জোগাড় করে আর গোটা মোহনপুরের লোক যেন নিমন্ত্রিত হয়। বিনোদের তরফে শুধু কিছু বন্ধু থাকবে। আর কেউ না।

বিয়ের আগের দিন বিনোদিনী এল মোহনপুরে। মা অনেক করে পাত্রের সম্বন্ধে জানতে চাইল। বাবা আর ভাইয়েরাও ঠারে ঠোরে বারবার জানতে চায় পাত্রের সম্বন্ধে। বিনোদিনী শুধু হেসে বলে, " পাত্র কেমন কি সে নিয়ে তোমাদের অত মাথাব্যথা কিসের। তোমরা তো শুধু এমন একজনের সাথে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছ, যে আমার অভিভাবক হবে। আমাকে সবথেকে ভাল খেয়াল রাখবে।"
ছোট ভাই জানতে চায় কলকাতায় যে ছেলেটাকে দেখেছিল সে কিনা। বিনোদিনী হেসে লুটোয়,
"আরে, ও তো প্রীতম। সেদিন রাত হয়ে গেছিল বলে আমার ওখানে শুয়ে পরেছিল।ও নিজেই আরশোলা দেখে ভয় পায়।"

বিনোদিনীর বাড়ির লোকের ভরসা আছে যে,আর যাই হোক ও যোগ্য মানুষকেই বিয়ে করবে।অতো পড়াশোনা করে, আরামে মানুষ হয়ে অন্তত ফালতু কোন ছেলে জোটাবে না। তাই আর বেশি ঘাঁটায়নি ওকে। কেন না, আর্থিক দিকে পুরোটাই প্রায় নির্ভরশীল ওর ওপর।

গতবার ভাইফোঁটায় বড়দির দেওয়া পাঞ্জাবিটা কেচে, ভাতের মাড় দিয়ে শুকিয়ে, পাট করে বালিশের নীচে রেখে দিয়েছিল পরেশ। পুরো ইস্ত্রি করা মনে হচ্ছে। সেটা গলিয়ে, চুলটাকে বেশ করে আঁচড়ে পুরনো চটিটা পায়ে দিয়ে বিয়েবাড়ি পৌঁছল। ঠিক তখনই একটা তুমুল শোরগোল শুরু হল। কি এক নাকি আজব ঘটনা ঘটেছে। যা শুধু মোহনপুর কেন বিশ্বশুদ্ধু এমন কেউ কি শুনেছে। ভিড়ের মধ্যে পরেশের পাঞ্জাবির পকেটের কাছটা পিঁজে গেল। মনে মনে ভাবল, সস্তার কিনা।যা হোক, কোন এক আজব ঘটনা নাকি দেখতে চলেছে। বিনোদিনীর বন্ধুরা জানত, তাই তারা আগেই প্রেস ডেকে এনেছিল। বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে লোকজন এদিক ওদিক করছে।

বিনোদিনী আর বিনোদ আলাদা দুটো মানুষ নয়, একজনই। নিজেকেই নিজে বিয়ে করবে বিনোদিনী। সে আবার কি!

একি ছেলে খেলা নাকি, নিজেকে নিজে বিয়ে মানে! সবাই হতভম্ব।

বেনারসি, গয়নায় অপরূপা বিনোদিনী উঠে দাঁড়াল বিয়ের মণ্ডপে। বলতে শুরু করল নিজের কথা,

"ছোটবেলায় কিছু বুঝতাম না।কিন্তু, বড় হয়ে মনে হল আমি কে? একজন নারী? তাহলে কোন পুরুষের প্রতি টান নেই কেন আমার! আমি কি পুরুষ? তাই বা কি করে হয়। আমার শরীরই বলে দিচ্ছে সেটা এক নারীর। আসলে মনটাই আমার দ্বিচারিতা করে। একই শরীরে আমার দুটো সত্তা, নারী এবং পুরুষের। তাই আমি পুরুষকেও যতটা ভালোবাসি নারীকেও ততটা। আসলে আমি ভালোবাসি আমাকে।"
এরপর আরও কত কি বলে গেল বিনোদিনী বা বিনোদ। রঙ্গ দেখছিল যারা তারাও সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল ওর কথা। পরেশের চোখের কোল বেয়ে জল নামছে। হঠাৎ খেয়াল হতে মুছে নিল। প্রত্যেককে বিয়েবাড়িতে আনন্দ করতে, খেতে বলল বিনোদিনী। শেষে বলল, " তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজেকেই নিজে বিয়ে করব। বাবা-মা আমার অভিভাবক চান, যে আমাকে ভাল রাখবে, যত্নে রাখবে, রক্ষা করবে। আমি মনে করি আমার থেকে ভাল কেউ আমায়

রাখতে পারে না। আমার থেকে ভাল কেউ আমায় বাসতে পারে না। আমিই আমাকে রক্ষা করতে পারি।"

বিনোদিনীর মা চিৎকার করে কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠলেন, "অ্যাতো পড়াশোনা শিখে একি ভীমরতি ধরল তোর। এত খরচ করে লোক হাসানো।"

ভিড়ের মধ্যে পরেশের দিকে চোখ পরতে বললেন,
"নয় আমার মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে থাকতিস। এই যে পরেশ, ওর সঙ্গে বিয়ে দিতুম। তবু তো একটা শক্ত পোক্ত ছেলে।"
বিনোদিনী মায়ের কাছে এসে বলে,
"এতদিন বিনোদিনী ছিল তোমার মেয়ে। আজ মনে করো না, বিনোদ নামে তোমার ছেলে বিনোদিনী নামের মেয়েকে বিয়ে করল। অথবা বিনোদ নামে ছেলে তোমার জামাই হল। আজ বিয়ে করে আমি কাল শ্বশুর বাড়ি যাব।কাল আমায় জামাই অথবা পুত্রবধূ যা কিছু ভেবে বরণ কোর মা।"

পরদিন খবরের কাগজ, টিভি তে হইহই করে বিনোদিনীর বিয়ের খবর বেরোল।মোহনপুরের বাসিন্দারা বলতে লাগল, " কালে কালে কত কি দেখব।"

পরেশ নিজে সবকটা খবরের কাগজ কিনে আনল। নিজের ছোট্ট ঘরে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো পড়তে লাগল। একটা মানুষই হয়ত শুধু বঝল, বিনোদিনীর কোন অস্তিত্ব সংকট নেই। তার পরিচয় সে একটা মানুষ। যার নিজের মত করে বাঁচার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

অণুগল্প

সেয়ানে সেয়ানে

দেবযানী দত্ত

"ভাল কথা বলছি ঠাকমা, বেলাবেলি ফোন করে খপর দাও বাড়িতে। নইলে আজ রাত্তিরেও তোমার ঘুমের দফারফা

হবে। দিদিমার গা কিন্তু গসগস করছে। আজও সারারাত জলপটি করতে হবে তোমায়।"

অসুস্থ সবিতাদেবী হাত জোড় করে মিনতিদেবীকে করুণ কণ্ঠে বলেন,

" না বেয়ান, আমি ঠিক আছি। "
মিনতিদেবী মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দেন, " তোমার চিন্তা নেই বেয়ান, আমি ফোন করব না। চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"
সারা ঘরে ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দেওয়া নামক প্রহসন করতে করতে বিজলি বলে উঠল,

" তোমাদের দুজনে পীরিত তো কিছু কম নয়। তা বাড়িতে টিকতে না পেরে মরতে এই অশান্তি নিবাসে এলে কেন!"
" বাজে কথা না বলে দুটো খাটের তলায় ভাল করে ঝাঁট দে। যেখানের ধুলো সেখানেই তো থাকছে।"
" তোমরা দুই বুড়ি বড় পিটপিটে বাবা।মেঝেতে ধুলো, কাপড় ময়লা। ওই মাসমাইনেতে কি হয় বল দিকি!"
" তার আমরা কি করব। মাস গেলে মোটা টাকা তো আমরা দিচ্ছি। সার্ভিস পাব না কেন।"

" উঁউউ টাকা যেন আমায় দেয়।শিল্পা ম্যাডাম কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনছে আর আমাদের বেলা কঞ্জুসগিরি!"
" এবার ম্যানেজমেন্টকে চিঠি লিখতেই হবে। সময়ে ডাক্তার মেলেনা।খাওয়ার অবস্থা তেমন আর কাজের লোকের এই ছিরি!"

হেসে লুটিয়ে পড়ে বিজলি।
" এককালে দিদিমুনি ছিলে না তুমি ঠাকমা, লেখ লেখ যত খুশি চিঠি চাপাটি লেখ। বাবুরা তোমার চিঠি পড়বেও না। এখানে শিল্পা ম্যাডাম কাত হলে অশান্তি নিবাসও কাত হবে।"

বলেই ন্যাতাটা দুবার ফিনাইল জলে ডুবিয়ে সপসপ করে মেঝে মুছে বেরিয়ে গেল বিজলি।

বৃদ্ধাশ্রমটার নাম শান্তি নিবাস। তবে বিজলি বা বিভিন্ন কাজের লোকের মুখে অশান্তি নিবাস। যে সমস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখানে আসেন, তাদের প্রথমে মোটা অঙ্কের টাকা জমা রাখতে হয়। আর মাসে মাসে বেশ কিছু দিতে হয়। তবে যে সব সুযোগ সুবিধার কথা বলে শান্তি নিবাস নিজের পরিচয়

দেয় তার ছিটেফোঁটাই মাত্র জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছনো মানুষগুলো পায়। কেউই তো প্রায় নিজের ইচ্ছে আসেনা। যারা তাদের আনে তারা টাকা দিয়েই খালাস।

মিনতিদেবী স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন আর সবিতাদেবী ছিলেন করপোরেশনের চাকুরে। দুজনের স্বামীই শিক্ষিত, উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। মিনতিদেবীর ছেলে সুজয়ের সাথে সবিতাদেবীর মেয়ে মল্লিকার খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়। ওদের একটাই মেয়ে তিন্নি। দুজনের স্বামী এক বছরের ব্যবধানে মারা যান।দূরে থাকলে দেখাশোনার অসুবিধের অজুহাতে সবিতাদেবীর বাড়ি বিক্রি করে মল্লিকা মাকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আসে। স্বামীর এবং নিজের পেনশন নিয়ে সবিতাদেবীর হাতে মোটা অংকের টাকাই ছিল। তাই মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আসতে দ্বিধা হয়নি। মানে লাগল সেদিন, যেদিন সুজয় তার বাড়ি এসে থাকার জন্যে খোঁটা দিয়ে কথা বলল। এক অজানা কারণে মেয়ে মল্লিকাও যেন তাতে সায় দিল। ততদিনে একমাত্র পেনশন ছাড়া বাদবাকি সবটাই মেয়ে জামাইকে দিয়ে ফেলেছেন সবিতাদেবী।

মিনতিদেবী শিক্ষিকা জীবনে বেশ কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন। সেই মেজাজ অবশ্য বাড়িতে দেখাতেন না।একান্নবর্তী পরিবারে মমতাময়ী রূপে নিজের কর্তব্য

পালন করেছেন। ঘর বাইরে দুটোই সামলেছেন। পরে আলাদা বাড়িতে আসেন। ছেলে সুজয়ের ব্যবসায় নিজের বহু টাকাই দিয়ে দেন।

এক জায়গায় থাকতে থাকতে সবিতাদেবী এবং মিনতিদেবীর মধ্যে সখ্যতার বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু, কোন অদৃশ্য কারনে সুজয় এবং মল্লিকা ধীরে ধীরে দুজনের থেকেই অনেক দূরে সরে যেতে থাকল। তারা তাদের ব্যবসা, ঘোরা বেড়ানো, লেট নাইট পার্টি, আর মেয়ের পড়াশোনায় মত্ত।
মিনতিদেবী মর্নিং ওয়াকে গিয়ে পায়ের হাড় ভাঙলেন। অপরেশন তারপর আয়ার তদারকি। ছেলে বৌমা সটান বিরক্তি প্রকাশ করল,
" বয়স হয়েছে, খেয়াল থাকে না? চলাফেরার ঠিক নেই। শুধু শুধু আমাদের ভোগান্তি দেওয়া। "

বড্ড অবহেলার স্বীকার হচ্ছিলেন দুই বৃদ্ধা। আর নয়। সুজয় মল্লিকাকে দেবার পরও হাতে বেশ কিছু টাকা ছিল। সাথে পেনশন। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে, যুক্তি করে শান্তি নিবাসে শেষ জীবনটা কাটাবেন স্থির করেন। সুজয় মল্লিকা সানন্দেই তাদের এই প্রস্তাবে মত দেয়। তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মিনতিদেবী এবং সবিতাদেবী দুজনের শরীরটাই অকেজো

হয়ে পড়েছে। তার উপর বাড়িতে নিজের সন্তানদের ব্যবহারে সাংঘাতিক মর্মাহত। কিন্তু, যে শান্তির আশায় তারা শান্তি নিবাসে এসেছিলেন, সেখানেও নিত্যদিন অসুবিধেতে দিন কাটে তাদের। এখানে আসার এক মাসের মধ্যে এখানের অব্যবস্থাপনা জানিয়ে বাড়িতে জানিয়েছিলেন দুজনে। তার বদলে শুনতে হয়েছে,

" নিজেরাই তো ডিশিসান নিয়ে গেছ।সুবিধে অসুবিধে সব জায়গায় আছে। একটু মানিয়ে নিতে হয়। ওখানে গিয়েও যদি নিত্যদিন আমাদের কাছে কাঁদুনি গাও তাহলে আমাদের তো নাজেহাল হতে হয়।"

এরপর থেকে একমাত্র তিন্নির খবর নেওয়া ছাড়া আর কোন অভিযোগের কথা বলেন না দুই বৃদ্ধা। তাই আজ সবিতাদেবীর অসুস্থতায় সেবা করেন মিনতিদেবী। উল্টোটাও হয়ত হবে পর দিন। কিন্তু, বাড়িতে খবর দেওয়ার কথা ভাবেন না দুই বৃদ্ধা। শুধু একে অপরকে যেন কত কথা বলে চলেন। কার শিক্ষায় ফাঁকি ছিল। একমাত্র সন্তানকে যতটা সম্ভব শিক্ষা দীক্ষা রুচি দিয়ে বড় করেছেন। কিন্তু, কার দোষে বৃদ্ধ বয়সে এই ভোগান্তি! মুখ ফুটে বলা আর হয়ে ওঠে না কখনো!

অণুগল্প

ইঁদুরকল

দেবযানী দত্ত

-যাক বাবা শান্তি, নেংটি ধরা পড়ল।কি গো মা, প্রকাশ এখনও বাজার থেকে ফেরেনি? আসলেই ইঁদুরকল ধরে বাইরে দূর করে দিয়ে আসতে বলবে।
-না বাবা, সে এখনও ফেরেনি। আসলেই ওই আপদকে দূর করাব।

মা ছেলের কথায় ছেলের বউ তনিমা ঢুকল।
- স্টুপিড প্রকাশ তো আজকাল বাজার থেকে আসার নামই করে না।সারাবাজার ঘুরে সস্তায় জিনিস কিনবে আর পকেট

ভারী করবে। ইসস্ ইঁদুরটা দেখছি আর গা ঘিনঘিন করছে। কখন যে সেই বাবু এসে ওটা ফেলবেন!
তনিমার শ্বশুর ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন,
- ওই হতচ্ছাড়া কখন ফিরবে কে জানে। সিঁড়ির মুখে ইঁদুরকলে ইঁদূর ঘুরছে। এখুনি প্রফেসর বাগচি আসবেন। প্রেস্টিজ কিছু রইল না।
এমনি সময় তনিমার দেওর জিম সেরে ফিরে তাড়াতাড়ি করে উঠতে গিয়ে ইঁদুরকলে হোঁচট খেল।

- ননসেন্স প্রকাশটার কাজ নিশ্চয়ই। ইডিয়ট একটা। সামান্য একটা ইঁদূর বাড়ি থেকে তাড়াতে ইঁদূরকল পেতেছে।

- আমি তো বলেছিলাম, বিষ দিয়ে ইঁদূর মারতে। তোমার মা বলল গনেশের বাহন। যত্তসব!
তনিমার শাশুড়ি রুখে উঠলেন,
- সেদিন মিসেস বাজোরিয়া বললেন ওদের বড়বাজারের দোকানে অনেক ইঁদূর। ওরা কখনো মারে না।তাই বলেছি। তাছাড়া মরা হোক বা জ্যান্ত ফেলবে তো প্রকাশ।
প্রকাশ বাড়ি ফিরতেই পরিবারের পাঁচজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই ঘৃণ্য প্রাণীটা ক'দিন তাদের বাড়ি

দাপাদাপি করে বেরিয়েছে। আজ যখন ধরা পড়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে দূর করতে হবে তো।

প্রকাশ ইঁদুরকলটা ধরে বাড়ি থেকে বেশ দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল ইঁদুরটা। ফিরতে তাকে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হল। নোংরা ইঁদূর যে কলে ধরা পড়েছিল সেটা প্রকাশ ধরেছিল যে। ইঁদুরকলটাও বাড়ির লোকের হুকুমে রাস্তায় ফেলে এসেছে।

সবাই এটা এক বাক্যে স্বীকার করল ইঁদূর দূর হয়ে তাদের অনেক দুশ্চিন্তা কমিয়েছে। যদি দামী জামা কাপড়, বইপত্র কেটে দিত কি হোত! তার ওপর ইঁদূর প্লেগের জীবাণু বহন করে। বিষ খেয়ে মরলেও কোথায় পচত কে জানে! গন্ধ ছাড়ত, পোকা হোত।

প্রকাশ ইঁদুরকল পেতে ভালোই করেছে।

রাতে সিঁড়ির তলার ঘরে শুয়ে প্রকাশ ভাবে, সে তো বাড়ির কর্তার নিজের ভাইপো। বাকি সদস্যরা তার জেঠিমা, দাদা,ভাই, বউদি। কিন্তু,ছোটবেলায় বাবা মা মারা যাওয়ায় সে চিরকাল অনাথই রয়ে গেল। কিসের লোভে সে এই বাড়িতে ইঁদুরকলের মত আটকে রইল। কেউ কি তার দরজা খুলে দেবে না।

এমন সময় খুটখুট শব্দ। তার মানে একটা নয়, আরও ইঁদূর আছে। ওদিকে ইঁদুরকল ফেলে দিতে হয়েছে। নিজের মনেই হেসে ওঠে প্রকাশ। আর কেউ ইঁদুরকল আনতে বলবে না ওকে। কারণ সুযোগই পাবেনা। প্রকাশ যে তখন নিজেই আগল খুলে মুক্তির সন্ধানে চলেছে। সে তো আর ইঁদুরের মত নিকৃষ্ট জীব নয়!

সপ্তপর্ণী
দেবযানী দত্ত
৭টি ছোট গল্পের সংকলন